بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ জুলাই, ২০২২ মোতাবেক ০১ ওফা, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে মুরতাদ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নবম যুদ্ধাভিযান তথা 'বাহরাইনের অভিযান'-এর বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ যা দেয়া হয় তা হযরত আ'লা বিন হাযরামী (রা.)-এর হুতুমের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান সম্পর্কিত। বর্ণিত আছে, হযরত আ'লা (রা.) হযরত জারুতকে এই আদেশ দেন যে, তুমি আব্দুল কায়স গোত্রকে সাথে নিয়ে হুতুমের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে হাজর থেকে (হুতুম) সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শিবির স্থাপন কর। এদিকে হযরত আ'লা (রা.) নিজ সৈন্যসামান্ত নিয়ে হুতুমের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় পৌঁছেন। দারীনের অধিবাসী ছাড়াও সকল মুশরিক হুতুমের কাছে গিয়ে একত্রিত হয়। একইভাবে সকল মুসলমান হযরত আ'লা বিন হাযরামী (রা.)-এর কাছে গিয়ে একত্রিত হয়। উভয় বাহিনী নিজেদের সম্মুখে পরিখা খনন করে। প্রতিদিন তারা নিজ নিজ পরিখা পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমন করতো আর যুদ্ধ শেষে পুনরায় খন্দকের পেছনে ফিরে আসতো। এক মাস ধরে এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমত্যে এক রাতে মুসলমানরা শত্রুশিবির থেকে অনেক হইচই ও চেচামেচি শুনতে পায়। তখন হযরত আ'লা (রা.) বলেন, কেউ কি আছে যে শত্রুর প্রকৃত অবস্থা জেনে আসবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হাযাফ বলেন, আমি এ কাজ করতে যাচ্ছি আর তিনি ফেরত এসে খবর দেন, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নেশায় মত্ত হয়ে আছে আর নেশায় বুদ হয়ে আবোলতাবোল বকছে। এই কারণেই এত হইচই, চিৎকার চেচামেচি শোনা যাচ্ছে। একথা শোনা মাত্র মুসলমানরা তড়িৎ শত্রুর ওপর আক্রমণ করে এবং শিবিরগুলোতে ঢুকে তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে শুরু করে। তারা (তথা শত্রুসেনারা) নিজেদের খন্দকের দিকে পলায়ন করে এবং অনেকে পরিখায় পড়ে মারা যায়, অনেকে বেঁচে যায়, অনেকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়, অনেককে হত্যা অথবা বন্দী করা হয়। মুসলমানরা তাদের শিবিরের সব জিনিস হস্তগত করে। যে ব্যক্তি পলায়ন করতে সমর্থ্য হয় সে কেবল ততটুকুই নিয়ে পালায় যতটুকু তার শরীরে ছিল। মোটকথা আবজার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। হুতুমের ভীতবিহ্বলতার অবস্থা এমন ছিল যেন তার দেহে প্রাণই নেই। সে নিজ ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু মুসলমানরা ততক্ষণে মুশরিকদের শিবিরে ঢুকে গিয়েছিল। হুতুম হতবুদ্ধি হয়ে স্বয়ং মুসলমানদের মাঝ থেকে পলায়ন করে নিজ ঘোড়ায় আরোহনের জন্য এগিয়ে যায়। ঘোড়ার পাদানিতে সে পা রাখতেই পাদানি ছিঁড়ে যায় এবং হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। মুশরিক শিবিরের সব জিনিসপত্র হস্তগত করার পর মুসলমানরা পরিখা পার হয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) আবজারের কাছাকাছি পৌঁছে যান কিন্তু আবজারের ঘোড়া হযরত কায়েস (রা.)-এর ঘোড়ার চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তখন

তিনি ভাবেন, সে না আবার আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। তিনি (রা.) আবজারের ঘোড়ার পিঠে বর্শা নিক্ষেপ করলে ঘোড়া আহত হয়। যাহোক, বর্ণিত রয়েছে যে, আবজার পলায়ন করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর হাতে ধরা পড়ে নি।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) আবজারের মাথায় কোপ মারেন, ফলে সেটি তার হেলমেট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এরপর হযরত কায়েস (রা.) পুনরায় এমন আঘাত করেন যে, সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

প্রভাতে হযরত আ'লা (রা.) গণিমতের মাল যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং যারা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এমন লোকদেরকে নিহত সর্দারদের মূল্যবান পোষাকও দিয়ে দেন। তাদের মাঝে হযরত আফীফ বিন মুনযের (রা.), হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) এবং হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে (বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ) মূল্যবান পোষাক প্রদান করা হয়।

হযরত সুমামা (রা.)-কে যে পোশাক দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে হুতুমের একটি নকশাকরা কালো মূল্যবান আলখেল্লা ছিল যেটি পরে সে খুব অহংকারের সাথে চলাফেরা করত। এই অভিযানের সফলতার বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে অবগত করা হয়। হযরত আ'লা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে একটি পত্রের মাধ্যমে পরিখাবাসীর পরাজয় এবং হুতুমকে হত্যা করার সংবাদ প্রদান করেন, যাকে যায়েদ (রা.) ও মুআম্মার (রা.) হত্যা করেছিলেন। তিনি পত্রে লিখেন- পরসমাচার, অতীব পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ আমাদের শত্রুদের চেতনাশক্তি প্রত্যাহার করে নেন। তাদের শক্তিসামর্থ্যকে সেই মদের কারণে বিলুপ্ত করেন যা তারা দিনের বেলায় পান করেছিল। আমরা পরিখা অতিক্রম করে তাদের মাঝে প্রবেশ করি এবং তাদেরকে মাতাল দেখতে পাই। দু–একজন বাদে বাকি সবাইকে আমরা হত্যা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা হুতুমের ভবলীলাও সাঙ্গ করেছেন আর হাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা হযরত আ'লা (রা.) হস্তগত করেছেন। কিন্তু অনেক স্থানীয় পারসিক নতুন এই সরকারের বিরোধীতা অব্যাহত রেখেছে। তারা প্রায়স লোকদের মাঝে এই সংবাদ প্রচার করে ভীতি সঞ্চার করছে যে, স্বল্প সময়ের ভেতর হাজর-এ মদীনা সরকারের পতন ঘটবে। মাফরুক শেবানী নিজ জাতি তাগলিব ও নামির সমন্বয়ে বাহিনী নিয়ে আসছে। হযরত আবু বকর (রা.) এই সংবাদ জানতে পেরে হযরত আ'লা (রা.)-কে লিখেন, অনুসন্ধানে যদি প্রমাণ হয় যে, বনূ শেবা বিন সালেবার নেতা মাফরুক তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে এবং নৈরাজ্যবাদীরা এ সংবাদ ছড়াচ্ছে তবে তাদেরকে হত্যা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে আর তাদেরকে পিষে ফেলবে এবং তাদের অনুগামী গোত্রগুলোকে এমনভাবে ত্রস্ত করবে যেন তারা কখনো মাথা চাড়া দেয়ার দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

মুরতাদরা দারীনে এসে একত্রিত হয়। এ সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন, দারীনের যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক দারীনের যুদ্ধ হযরত উমর (রা.)-এর যুগে হয়েছে বলে লিখেছেন। যাহোক, মুরতাদরা এখানে একত্রিত হয়। দারীন পারস্য উপসাগরের একটি দ্বীপ ছিল যা কয়েক মাইল দূরে বাহরাইনের বিপরীত দিকে অবস্থিত। সেখানে প্রথম থেকেই খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। হযরত আ'লা (রা.)-এর নিকট পরাজিত হবার পর বেঁচে যাওয়া পরাজিত বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ অংশ নৌকায় চড়ে দারীনে চলে যায় এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। হযরত আ'লা বিন হাযরামী (রা.) বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য করে লিখেন, তাদের মোকাবিলা কর। এমনকি হযরত উতায়বা বিন নাহাস এবং হযরত আমের বিন্ আব্দুল আসওয়াদকে নির্দেশ দেন, তোমরা যেখানেই আছ সেখানেই অবস্থান কর আর প্রতিটি রাস্তার মাথায় মুরতাদদের মোকাবিলা করার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত কর। এছাড়া তিনি হযরত মিসমাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সামনে অগ্রসর হয়ে মুরতাদদের মোকাবিলা করেন। আবার তিনি হযরত খাসাফা তায়মী এবং হযরত মুসান্না' বিন হারসা শেবানীকে নির্দেশ দেন, তারাও যেন মুরতাদদের মোকাবিলা করেন। বাহরাইনে মুরতাদসৃষ্ট বিদ্রোহের আগুন নিভানোর কাজে মুসান্না বিন হারেসা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত আ'লা বিন হাযরামির সাথে যোগ দেন এবং বাহরাইনের উত্তর দিকে রওয়ানা হন। তিনি কাতীফ এবং হাজর দখল করেন। নিজের মিশন তিনি অব্যাহত রাখেন এবং সেসব পারস্য সেনাবাহিনী ও তাদের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন যারা বাহরাইনের মুরতাদদের সাহায্য করেছিল। মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি হযরত আ'লা বিন হাযরামী (রা.)-এর সাথে যোগ দেন যেসব অঞ্চলের মানুষ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপকূলীয় অঞ্চল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত মুসান্না বিন হারেসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) বলেন, তিনি কোন অজ্ঞাতকূলশীল অভদ্র মানুষ নন বরং তিনি হলেন মুসান্না বিন হারসা শেবানী (রা.)। অতএব হযরত মুসান্না বিন হারসা শে'বানী (রা.) মুরতাদদের প্রতিহত করার জন্য রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে যান। মুরতাদদের মধ্যে কেউ কেউ তওবা করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের (তওবা ও বয়আত) গ্রহণ করা হয়। আবার কতক তওবা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অস্বীকারের ওপর অটল থাকে, তাই তাদেরকে নিজ এলাকায় ফেরত যেতে দেয়া হয় নি।
তাই তারা সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করে যেদিক থেকে তারা এসেছিল এমনকি তারা নৌকাযোগে দারীন পৌঁছে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে এক স্থানে একত্রিত করে দেন। হযরত আ'লা (রা.) তখনো মুশরেকদের সেনাবাহিনীতে অবস্থান করছিলেন, ইতোমধ্যে তিনি বকর বিন ওয়ায়েলকে যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তর পান এবং জানতে পারেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ওপর আমল করবে এবং তার ধর্মের সমর্থন করবে। হযরত আ'লা (রা.) যখন তাদের সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তারা মুসলমান আর তারা বিদ্রোহ করছে না এবং যুদ্ধ করবে না এবং যখন তাঁর [অর্থাৎ হযরত আ'লা (রা.)-এর] এই বিশ্বাস জন্মালো যে তাদের যাওয়ার পর বাহরাইনের অধিবাসিদের কারো সাথে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না তখন তিনি (রা.) বলেন, 'এখন সকল মুসলমানের দারীন অভিমুখে যাত্রা করা উচিত' এবং তিনি (রা.) তাদেরকে দারীন অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। এই ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় যে, কীভাবে তারা সমুদ্রকে অতিক্রম করতে পারে? এই ঘটনার বর্ণনায় কিছুটা সত্যতাও থাকতে পারে অথবা অতিরঞ্জিতও করা হয়ে থাকবে। যাহোক এতে যদি কিছুটা সত্য থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা আমি শেষের দিকে তুলে ধরবো। যাহোক বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের নিকট নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি ছিল না যাতে আরোহন করে তারা দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতো। এই অবস্থা দেখে হযরত আ'লা বিন হাযরামি (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের একত্রিত করে তাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন। বক্তৃতায় তিনি (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য শয়তানের

দলকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং যুদ্ধকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি প্রথমে স্থলে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়েছেন যেন সেই নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তোমরা সমুদ্রপথেও শিক্ষা লাভ করতে পার। নিজ শত্রুর দিকে অগ্রসর হও, সমুদ্রের বুকচিরে তাদের দিকে অগ্রসর হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্যই তাদেরকে একত্রিত করেছেন। তারা সমস্বরে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এমনটাই করবো আর দাহ্‌না উপত্যকার মোজেযা প্রত্যক্ষ করার পর আমরা যতদিন জীবিত থাকবো তাদেরকে ভয় করবো না। তাবারীতে এই রেওয়ায়াতটি লিখিত আছে। সেই মোজেযা যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ, মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া উটগুলোও ফিরে এসেছিল এবং পানির ঝর্ণা প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা বলে যে আমরা সেই নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করেছি তাই সমুদ্রপথে যাত্রার নিদর্শনও আমরা প্রত্যক্ষ করবো। হযরত আ'লা (রা.) এবং সকল মুসলমান সেই স্থান থেকে যাত্রা করে সমুদ্রের কিনারায় এসে উপস্থিত হন। হযরত আ'লা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করছিলেন যে "হে সবচেয়ে দয়ালু, হে পরম বদান্যশীল, হে পরম সহনশীল, হে এক অদ্বিতীয়, হে অমুখাপেক্ষী, হে চিরঞ্জীব ও জীবনদানকারী, হে মৃতকে জীবনদানকারী, হে চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, হে আমাদের প্রভু!

যাহোক বর্ণনা করা হয় যে, হযরত আ'লা (রা.) সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে বললেন 'এই দোয়া করতে করতে নিজেদের বাহন সমুদ্রে নামিয়ে দাও'। সুতরাং সকল মুসলমান নিজেদের সেনাপতি হযরত আ'লা বিন হাযরামির অনুসরণে তাদের ঘোড়া, গাধা, উট ও খচ্চরের ওপর আরোহন করে সেগুলোকে তার পেছনে সমুদ্রের মধ্যে নামিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কুদরতে তারা সেই উপসাগর কোন রকম কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই অতিক্রম করে। এমন মনে হচ্ছিল যে সেখানে তারা নরম বালির ওপর চলছে যাতে পানি ফেলা হয়েছে। তাদের উটের পাও ডুবে নি আর সমুদ্রে মুসলমানদের কোন জিনিসও হারায় নি। ছোট্ট একটি পুটলি হারানোর উল্লেখ পাওয়া যায় তাও হযরত আলা (রা.) তুলে এনেছিলেন। যাহোক, সমুদ্র সৈকত থেকে **দারাইন** পর্যন্ত সফরের বর্ণনা করা হয় যে, নৌকায় চেপে এক দিন এবং এক রাতে এই পথ পাড়ি দিতে হতো, কিন্তু এই কাফেলা এক দিনের খুব অল্প সময়েই এই দূরত্ব অতিক্রম করে। তাবারির ইতিহাসগ্রন্থে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বতর্মান যুগের কোন কোন লেখক এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তারা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, সম্ভবতঃ পারস্য উপসাগরে তখন ভাটা এসে থাকবে অথবা রেওয়ায়েতে বাড়াবাড়ি থাকবে; আর প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে মুসলমানরা নৌকা পেয়ে গিয়ে থাকবেন যাতে আরোহণ করে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাকবেন। কিন্তু যাহোক, কোন রেওয়ায়েতেই এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মানুষ এসব রেওয়ায়েত লিখেছেন, তারা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরা দারীন পৌঁছে গিয়েছিলেন; কীভাবে পৌঁছে ছিলেন তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। বাকি রইল বিভিন্ন মু'জিযা (বা অলৌকিক নির্দশনের) বিষয়টি। (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক তফসীরে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে যে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.)-এর হিজরতকালে সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা থেকে এটি মনে হয় যে, বনী ইস্রাঈল পবিত্র ভূমিতে (গমনের) সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছিল; তাদের পশ্চাতে ফেরাঊনের সেনাদল এসে উপস্থিত হয়। তাদের দেখে বনী ইস্রাঈল বিচলিত হয়ে পড়ে আর মনে করে যে, এখন ধরা পড়ে যাব; কিন্তু খোদা তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করেন। আর হযরত মূসাকে বলেন, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠে আঘাত কর; যার ফলে সমুদ্রের (মাঝে) একটি রাস্তা (দৃশ্যমান) হয় আর সেই পথ দিয়ে তারা সম্মুখে অগ্রসর হন। তাদের দু'ধারেই পানি ছিল যা বালুর টিলা সদৃশ অর্থাৎ, উঁচু দেখা যাচ্ছিল। ফেরাঊনের সেনাদল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু বনী ইস্রাঈলের নিরাপদে পাড়ি দেয়ার পর পুনরায় পানি বৃদ্ধি পায়; আর মিশরীয়রা নিমজ্জিত হয়। তিনি লিখেন, এই ঘটনাটি বুঝতে হলে একথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সকল মু'জেযা (তথা অলৌকিক নিদর্শন) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়। কোন মানুষের এতে হাত ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অতএব, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি (হাতে) তুলে নেওয়া এবং (তা দিয়ে) সমুদ্র বক্ষে আঘাত করা কেবল এক নিদর্শনের দৃষ্টান্তস্বরুপ ছিল; এমন নয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর এই লাঠির সমুদ্র ছোট হয়ে যাওয়ায় কোন ভূমিকা ছিল। একইভাবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, সমুদ্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর হযরত মূসা (আ.) সেই পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। বরং পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা সম্পর্কে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** ফারাকা **দ্বিতীয়তঃ** ইনফালাকা, যার অর্থ আলাদা হয়ে যাওয়া। কাজেই, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী অনুযায়ী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ যা সামনে আসে তাহলো, বনী ইস্রাঈলের অতিক্রম করার সময় সমুদ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ, (জলরাশি) সমুদ্রতীর থেকে সরে গিয়েছিল এবং জেগে ওঠা স্থল থেকে বনী ইস্রাঈলীরা (পথ) পাড়ি দিয়েছিল আর সাগর তীরে বা সমুদ্র সৈকতে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। যেমন নেপোলিয়নের জীবনচরিতেও লেখা আছে যে, মিশরের ওপর আক্রমনকালে সেও তার সেনাবাহিনীর একটি অংশসহ লোহিত সাগরের তীর দিয়ে ভাটার সময় অতিক্রম করেছিল আর তার (পথ) পাড়ি দিতে দিতে জোয়ারের সময় হয়ে যায় আর বড় কষ্টে তারা প্রাণে বাঁচেন। এই ঘটনায় অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় যে মু'জিযা ছিল তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা বনী ইস্রাঈলকে এমন সময় সমুদ্র তীরে পৌঁছিয়েছিলেন যখন ভাটার সময় ছিল আর হযরত মূসা (আ.)-এর হাত তুলতেই ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী সমুদ্রের পানি হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু ফেরাঊনের সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নামে তখন এমন অসাধারণ বাঁধা তাদের পথে সৃষ্টি হয় যে, তার বাহিনী অতি মন্থর গতিতে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে ফলে (তাদের) সমুদ্রে থাকা অবস্থাতেই জোয়ার আসে আর শত্রুরা নিমজ্জিত হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হতেই থাকে আর এক সময়ে পানি তীর থেকে নীচে অনেক দূরে নেমে যায় আবার আরেক সময়ে তা স্থলে অনেক দূর ভেতরে এসে যায় । সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনা এই জোয়ার-ভাটার অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত মূসা (আ.) এমন সময়ে সমুদ্র পাড়ি দেন যখন ভাটার সময় ছিল আর সমুদ্রের পানি নীচে নেমে গিয়েছিল, আর এর পর ফেরাঊন পৌঁছায়। আর এর কারণ হল, সে কমপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-এর একদিন পর রওয়ানা হয়েছিল, সে (পরিমরি করে) ছুটতে ছুটতে যখন সমুদ্রের কাছে পৌঁছে তখন হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রের যে-ই জলশূণ্য স্থান অতিক্রম করছিলেন তার অধিকাংশ পাড়ি দিয়ে ফেলেছিলেন। ফেরাঊন তাঁকে (সমুদ্র) পাড়ি দিতে দেখে ত্বড়িৎ নিজের রথ তাতে

নামিয়ে দেয়, কিন্তু সমুদ্রের বালি ভেজা ছিল যা তার রথগুলোর জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। তার রথগুলো তাতে আটকে যেতে আরম্ভ করে আর এতটাই বিলম্ব হয়ে যায় যে, জোয়ারের সময় হয়ে যায় আর পানি বাড়তে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় তার জন্য দু'টি পথই কঠিন ছিল। সে সামনেও যেতে পারছিল না আর না-ই পেছনে। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, সমুদ্র তাকে মাঝপথেই ঘিরে ফেলে আর সে এবং তার অনেক সাঙ্গপাঙ্গ সমুদ্রে ডুবে যায়। আর যেহেতু জোয়ারের সময় ছিল, সমুদ্রের পানি যেহেতু তীরমুখী বেড়েই চলছিল (তাই) সেই পানি তাদের শবদেহগুলোকে শুকনো স্থানে (ভাসিয়ে) নিয়ে আসে।

যাহোক, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, মুসলমানরা কোন ভাবে দারীনে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানেও হয়তো এমন কোন ঘটনাই ঘটে থাকবে অর্থাৎ, জোয়ার-ভাটার (ঘটনা)। দারীনে পৌঁছার পর সেখানে বিদ্রোহী মুরতাদদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা বা সংঘর্ষ হয় আর চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে তারা অর্থাৎ; বিদ্রোহীরা মারা যায়। সংবাদ দেওয়ার মতোও কেউ রক্ষা পায়নি। মুসলমানরা তাদের পরিবারবর্গকে দাস-দাসী বানিয়ে নেয় এবং তাদের ধন-সম্পদ করতলগত করে। প্রত্যেক অশ্বারোহী (সৈনিক) মালে গণিমত হিসেবে ছয় হাজার এবং প্রত্যেক পদাতিক (সৈনিক) দু'হাজার দিরহাম করে লাভ করে। সমুদ্রতীর থেকে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মুসলমানদের পুরো দিন লেগে যায়, তাদের দমন করে তারা ফেরত চলে আসে।

হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.)'র শাহাদতের ঘটনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন শুধুমাত্র তাদের ব্যতীত যারা সেখানেই অবস্থান করা পছন্দ করেছেন। হযরত সুমামা বিন উসালও প্রত্যাবর্তনকারীদের একজন ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন হাযফ বলেন, আমরা **বনু কায়েস বিন সা'লেবার** একটি ঝরনার পাশে অবস্থান করছিলাম। লোকজনের দৃষ্টি হযরত সুমামার প্রতি নিবদ্ধ হয় আর তারা তার গায়ে হুতুমের আলখাল্লা পরিহিত দেখতে পায়। এটি হুতুমের সেই আলখাল্লা ছিল যা তার নিহত হওয়ার পর মালে গনিমত হিসেবে হযত সুমামাকে দেয়া হয়েছিল। তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করে। অর্থাৎ, সেই গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, তুমি গিয়ে হযরত সুমামাকে জিজ্ঞেস কর যে, এই আলখাল্লা তুমি কোথায় পেলে? আর হুতুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যে, তুমিই কি তাকে হত্যা করেছ; না-কি অন্য কেউ? হুতুম তাদের নেতা ছিল। সেই ব্যক্তি এসে হযরত সুমামাকে জোব্বা সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করে। তিনি বলেন, এটি আমি মালে গনিমত হিসেবে পেয়েছি। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, হুতুমকে কি তুমি হত্যা করেছ? হযরত সুমামা বলেন, না। যদিও আমার তাকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, (তাহলে) এই জোব্বা তোমার কাছে কোত্থেকে এলো? হযরত সুমামা বলেন, এর উত্তর আমি তোমাকে পূর্বেই দিয়েছি যে, মালে গণিমত হিসেবে পেয়েছি। তখন সেই গোত্রের ঐ ব্যক্তি তার বন্ধুদেরকে এসে পুরো আলোচনা সম্পর্কে অবগত করে। তখন তারা সবাই একত্রিত হয়ে হযরত সুমামার কাছে আসে এবং তাকে ঘিরে ফেলে।

তারা সবাই বলে, আপনি হুতুমের হত্যাকারী। হযরত সুমামা (রা.) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, আমি তার হত্যাকারী নই। অবশ্য এ আলখাল্লাটি আমি গনিমতের মালের অংশ হিসেবে পেয়েছি। তখন তারা বলে, অংশ তো কেবল হত্যাকারীই পায়। হযরত সুমামা (রা.) বলেন, এ আলখাল্লাটি তার গায়ে ছিল না, বরং তার বাহন কিংবা তার মালপত্র থেকে পাওয়া গেছে। একথা শুনে লোকেরা বলে, তুমি মিথ্যা বলছ। এরপর তারা তাকে শহীদ করে দেয়।

দশম অভিযান সম্পর্কে লিখা রয়েছে: এটি হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)-এর নেতৃত্বে মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)-কে দেয়ার পর নির্দেশ দেন, তিনি যেন ইয়েমেনের অঞ্চল তিহামায় যান।

তিহামা: অভিধানে তিহামা শব্দের অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম এবং বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে অভিধানে এর আরেকটি অর্থ নিচু জমি বা নিম্নভূমি। ইয়েমেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত নিম্নভূমির একটি অঞ্চল রয়েছে, যাকে তিহামা বলা হয়। তিহামার উত্তরসীমান্ত প্রায় মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দক্ষিণ সীমান্ত ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ মাইল দূরে শেষ হতো। তিহামা ইয়েমেনের একটি জেলা ছিল যাতে অনেকগুলো গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর ছিল। এই হলো ইয়েমেনের তিহামার পরিচিতি।

হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)-এর পরিচয় হলো: হযরত সুওয়ায়েদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল মুকাররিন বিন আয়েয। তিনি বাযায়না গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু আদী, (কোথাও আবার) তার ডাক নাম আবু আমর বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৫ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন আর এরপর অন্য সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত নো'মান বিন মুকাররিন (রা.)-এর ভাই ছিলেন, পারস্য বিজয়ের ক্ষেত্রে যিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

হযরত সুওয়ায়েদ (রা.)-এর তিহামা যাওয়া এবং সেখানে মুরতাদদের বিরুদ্ধে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তিহামার অধিবাসীদের ধর্মত্যাগ এবং বিদ্রোহের অবস্থা ও বিভিন্ন ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ১০ হিজরী সনে বিদায় হজ্জের পর ইয়েমেনে কয়েকজন যাকাত সংগ্রহকারী নিয়োগ দেন। তিনি (সা.) ইয়েমেনকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তিহামায় তিনি তাহের বিন আবু হালাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিহামায় নিম্নশ্রেণীর আরব ছাড়াও দুটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। একটি আক এবং অন্যটি আশআর।

তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লিখা রয়েছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইতাব বিন আসীদ এবং হযরত উসমান বিন আবুল আস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখেন যে, আমাদের অঞ্চলে মুরতাদরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসেছে। মুরতাদরা কেবল মুরতাদ ছিল না, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণও করত। এখানেও একই অবস্থা বিরজ করছিল। হযরত ইতাব (রা.) তার ভাই হযরত খালেদ বিন আসীদ (রা.)-কে তিহামাবাসীদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। যেখানে বনু মুদলেজের একটি বড় দল এবং খুযাআ ও কেনানার বিভিন্ন দল বনু মুদলেজের বনু শনুব বংশের জন্দুব বিন সালমার নেতৃত্বে মুরতাদ হয়ে মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছিল। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় আর হযরত খালেদ বিন আসীদ (রা.) তাদেরকে পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং অনেক লোককে হত্যা করেন। এতে বনু শনুব গোত্রের লোক সবচেয়ে বেশি মারা পড়ে। এ ঘটনার পর তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি হযরত ইতাব (রা.)-এর অঞ্চলকে ধর্মত্যাগীদের নৈরাজ্য থেকে পবিত্র করে আর জন্দুব পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পর সে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী

(সা.)-এর তিরোধানের পর তিহামায় সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহ করে আক ও আশআর গোত্র। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন লোক একত্রিত হয় এবং খাযম গোত্রের লোকেরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা উপকূলীয় আ'লাব নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে এবং তাদের সাথে সেই সৈন্যরাও এসে যোগ দেয় যাদের কোন নেতা ছিল না। আ'লাবও মক্কা এবং সমুদ্র উপকূলের মধ্যবর্তী আক গোত্রের অঞ্চল। হযরত তাহের বিন আবু হালা হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সংবাদ প্রদান করেন এবং নিজেই তাদেরকে দমন করার জন্য যাত্রা করেন আর নিজের যাত্রা করার সংবাদও তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখে জানিয়ে দেন। হযরত তাহেরের সাথে মাসরূক আক্কী এবং আক গোত্রের সেসব সদস্য ছিল যারা মুরতাদ হয় নি। এভাবে তারা আ'লাব গিয়ে তাদের মুখোমুখি হয় এবং সেখানে তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদেরকে পরাজিত করেন। মুসলমানরা তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে। পুরো পথে নিহত শত্রুদের (লাশের) দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা এক মহান বিজয় লাভ করে।

তিহামায় ধর্মত্যাগের ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, তিহামার মুরতাদদের দমনের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন তাহের বিন আবু হালা, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে তিহামা অঞ্চলের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যা আক ও আশআর গোত্রের লোকদের বসতিস্থল ছিল। পরবর্তীতে আবু বকর (রা.) উকাশা বিন সওরকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তিহামায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের একত্র করে তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেন। হযরত উকাশা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হাযার মওতের দুটি অঞ্চল সাকাসিক ও সুকুনের কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বাজীলা গোত্রের কাছে জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ বাজালীকে ফেরত পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন ইসলামের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিজ জাতির মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগকারী মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেন আর এরপর খাসম গোত্রের কাছে যান এবং তাদের মুরতাদদের সাথেও যুদ্ধ করেন। জারীর নিজ অভিযানে রওয়ানা হয়ে যান এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালন করেন। অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউই তার বিরুদ্ধে লড়তে আসে নি; তিনি তাদের হত্যা করেন ও ছত্রভঙ্গ করে দেন।

এগুলো যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা চলছে, পরবর্তীতে একাদশ অভিযান বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। তাদের মধ্যে দুজন হলেন বুর্কিনাফাসো নিবাসী আমাদের দুই যুবক। গত ১১ জুন সন্ধ্যায় তারা তাদের ডোরি রিজিওনের একটি গ্রামে ছিলেন যেখানে জঙ্গীরা আক্রমণ করে আর অনেক মানুষ এখানে নিহত হয়, তাদের মধ্যে আমাদের এই দু'জন আহমদী খাদেমও শহীদ হন, যারা তখন তাদের দোকানে কাজ করছিলেন। (তাদের ওপর) গুলিবর্ষণ করা হয় এবং ঘটনাস্থলেই তারা শহীদ হন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের মধ্যে একজনের নাম হলো ডিকো যাকারিয়া, তার বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। তিনি ডোরি রিজিওনের খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঘানার মাদ্রাসাতুল হিফয-এ কুরআন শরীফ হিফয করতেও গিয়েছিলেন, কিছুদিন হিফয করার পর ফেরত চলে আসেন। জামা'তের সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকতেন, প্রত্যেক কাজের জন্য 'লাব্বায়েক' বলে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়তেন, তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযও

নিয়মিত পড়তেন, নিজের বিভিন্ন চাঁদাও নিয়মিত প্রদান করতেন। নিয়মিত মাসিক আয় ছাড়াও যদি কোন আয় হতো তবে সেটির চাঁদাও তৎক্ষণাৎ প্রদান করতেন। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ছিল, নিয়মিত জুমু'আর খুতবা শুনতেন; এম.টি.এ.-র অন্যান্য অনুষ্ঠানও খুব আগ্রহের সাথে দেখতেন। সেখানকার স্থানীয় মুবাল্লেগ বলেন, তার সাথে সর্বশেষ যখন দেখা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের গভীর বাসনা ছিল তার। (সর্বদা ভাবতেন), কবে যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে। মুয়াল্লেম সাহেব লিখেছেন, তিনি একজন আদর্শ খাদেম ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় শহীদ ছিলেন ওডিকো মূসা সাহেব। তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সাইতিনগার-এর কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিজ জামা'তের সব অনুষ্ঠানেই সবার চেয়ে বেশি অংশ নিতেন এবং অন্যদের অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামায পড়তেন ও চাঁদা দিতেন। তার জামা'তে মসজিদ ছিল না। তাই তিনি স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে একটি ছাউনি দিয়ে সেখানে নিয়মিত নামায পড়া যায়। তিনি আমাকে নিয়মিত চিঠিও লিখতেন। রাজধানী থেকে কেউ সফরে গেলে তাদের আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তা করতেন। নিজে সাথে থেকে কাজ করাতেন এবং সফরে অংশ নিতেন। তিনিও তাঁর অবর্তমানে দুজন স্ত্রী এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

এই দুই শহীদ সম্পর্কে সেই জামা'তের আমীর লিখেন, এ দু'জন খাদেমই আমাদের স্থানীয় মুবাল্লেগ ডিকো আহমদ বোরিমা সাহেবের ভাই ছিলেন। যিনি বর্তমানে রেডিও আহমদীয়া ডোরির ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের পিতা ইব্রাহীম বুনতি সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তিনি ডোরি রিজিওনের আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমও ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এরপর আমীর সাহেব দোয়ার আবেদন করে লিখেন, ২০১৫ সাল থেকে বুর্কিনাফাসোতে সন্ত্রাসী হামলা চলছে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে তারা অনেক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। ২০ লাখের বেশি মানুষ ইতোমধ্যে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করুন। পৃথিবীতে এখন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে এরূপ সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং তাদের সুবুদ্ধির উদয় হোক।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে জনাব নুরাম খান সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ ইউসুফ বেলুচ সাহেবের। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের উমরকোট জেলার ওসতী সাদেকপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি বেলুচ জাতিগোষ্ঠীর সদস্য, ডেরা গাজী খান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সনে হযরত গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা হিজরত করে সাদেকপুর উমর কোটের তাহরীকে জাদীদের জমিতে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায় ৬ বছর রাবওয়াতেও অবস্থান করেন এবং এই পাড়ার মসজিদে খাদেম হিসেবে সেবা করারও সৌভাগ্য পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। নিজের

অবর্তমানে তিনি তার স্ত্রী ছাড়াও সাত পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র সাব্বির আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে বর্তমানে আইভোরি কোস্টে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজ পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। মরহুমের দুই পৌত্র মুরব্বী সিলসিলাহ্।

তার পুত্র সাব্বির আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ লিখেন, আমার পিতা বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। শৈশব থেকেই আমরা তাঁকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। প্রতিদিন ফযরের নামাযের পর উঁচু স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, যখনই আমি বাড়ি যেতাম আমাকে ডেকে বলতেন, আমার দুটি কথা সর্বদা মনে রাখবে। সর্বদা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং নিজ ওয়াকফের দাবি পূর্ণ করবে। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। পথচারীদেরও ঘরে নিয়ে আসতেন। তার মৃত্যুতে অনেক অ–আহমদী এবং হিন্দুরাও সমবেদনা জানাতে এসেছেন আর সবাই তার প্রশংসা করেছেন এবং এটিও বলেছে যে, আমাদের পিতা মৃত্যু বরণ করেছেন, কেননা তিনি দরিদ্রদের অনেক সাহায্য করতেন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী ওয়াকফে নও স্নেহের মুবারেযা ফারুকের, যে ফারুক আহমদ সাহেবের কন্যা ছিল। সে-ও সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এই মেয়ে যখন এগারো বছর বয়সের ছিল তখন বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ তারে হাত লাগার কারণে তার দুই হাতই অকেজো হয়ে যায় এবং উভয় হাত কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও স্নেহের এই মেয়ে মনোবল হারায় নি। সে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যায়। প্রথমে সে মুখ দিয়ে কলম ধরে লেখার অনুশীলন করে। এরপর দুই কনুই দিয়ে কলম ধরে লেখার অনুশীলন করে। আর এভাবে কয়েক মাসেই খুব সুন্দর লেখা শিখে যায়। পাশাপাশি লেখাপড়াও চালিয়ে যায়। কিছুদিন পর তার পরিবার রাবওয়া চলে আসে। এখানেও সে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকে। ২০১৩ সালে ভালো নম্বারে বি.এ. সম্পন্ন করে। এরপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে আরবীতে এম.এ. সম্পন্ন করে। ওয়াকেফায়ে নও হিসেবে সে কিছুদিন তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ সেবা করে। কুরআন করীম শুদ্ধ উচ্চারণে এবং শাব্দিক অনুবাদসহ শিখে এবং সবসময় শতভাগ নম্বর পেতো। পাড়ায় কুরআন অনুবাদের ক্লাসও নিতো। নিজের অবর্তমানে সে তার পরিবারে পিতামাতা ছাড়াও দুই ভাই এবং দুই বোন রেখে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পিতামাতাকেও ধৈর্য্য ও মনোবল দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মোকাররম আঞ্জুমানা বাতারা সাহেবের, যিনি আইভোরিকোস্টে, মাসাদোগো এলাকায় জামা'তের মুয়াল্লেম ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেখানকার মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মরহুম সহজ-সরল, নামায রোযায় নিয়মিত, বিনয়ী, দোয়ায় অভ্যস্ত, পুণ্যবান ও পবিত্র প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। অনেক বেশি নফল নামায পড়তেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল রোযা রাখতেন। তার দোয়াও ব্যাপকভাবে কবুল হতো। খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। একজন সর্বোত্তম মুবাল্লেগ ছিলেন। ১৯৯৭ সালে এক স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর **স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, তিনি একটি জঙ্গলে রয়েছেন এবং সেখান থেকে নাসিয়া নামক একটি গ্রামে যাচ্ছেন। সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি একটি**

তরবারি দিয়ে রাস্তা প্রস্তুত করছেন এবং একইসাথে উচ্চস্বরে কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করছেন। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের পর একদিন আমি জানতে পারি যে, উমর মুআয সাহেব নামের একজন আহমদী মুবাল্লেগ তবলীগের উদ্দেশ্যে নাসিয়া এসেছেন। এটি শুনে তিনি নিজেও নাসিয়া যান আর জামা'তের বাণী শুনতেই বয়আত করে নেন এবং বলেন যে, এটিই ছিল সেই বাণী যা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে আমাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ, চেষ্টা করে আমাকে সেই গ্রামে যেতে হবে যেখানে আমি (প্রকৃত) ধর্মের সন্ধান পাব। যাহোক, আহমদীয়াত গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি রীতিমতো জামা'তের মুয়াল্লেম হিসেবে জীবন উৎসর্গ করেন। জামা'তের সেবা আরম্ভ করেন। ২০০২ সালে যখন দেশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন কেন্দ্রের সাথে তার এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুয়াল্লেম সাহেব তার গ্রাম এবং আশেপাশের জামা'তগুলোর সাথে নিজের যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং সর্বাবস্থায় জামা'তের লোকদের তা'লীম ও তরবিয়তের কাজ অব্যাহত রাখেন। কেন্দ্রের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করেন। এভাবে তিনি তার গ্রামে নিজ বাড়ির উঠানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন আর সেখান থেকেই জামা'তের লোকদের তা'লীম ও তরবিয়্যতের কাজও সম্পাদন করতেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জামা'তের যে কোন অনুষ্ঠানে নিয়মিত দীর্ঘ সফর করে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসাতেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। হুযুরের সাথে MTA-এর অনুষ্ঠান 'দি ফ্রেঞ্চ মুলাকাত' এ-ও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সাক্ষাতে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন আর লোকজনকে শুনাতেন যে, এই সাক্ষাৎ আমার জীবনের অনেক সুন্দর একটি অংশ, যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

২০০৪ সনে আমি যখন বুর্কিনাফাসো সফরে যাই সেখানে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর আমাকে বলেন, এই যে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করছি, এতে আমার এক নতুন জীবন লাভ হয়েছে। আর আপনার এই সফরের ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন আর এই কল্যাণ আমি লাভ করছি। তিনি বলেন, দুই মাস পূর্বে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমনকি বাড়ির লোকেরা মনে করেছিল এটি আমার অন্তিম মুহূর্ত। তিনি বলেন, সেই সময় আমি স্বপ্নে দেখি, **(তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন যে,) আমি তার মাথায় হাত বুলাচ্ছি। আর তিনি বলেন, স্বপ্নেই আমি অনুভব করি যে, আমার সমস্ত রোগ বালাই দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে।** তিনি বলেন, যখন আমি জাগ্রত হই তখন বাস্তবিক অর্থেই সমস্ত রোগ-বালাই দূর হয়ে গিয়েছিল, আর আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। যাহোক আমি যখন সেখানে সফরে যাই তখন তিনি বলেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা বাহ্যিকভাবেও পূর্ণ করে দিন। নিজের মাথা এগিয়ে দিয়ে তাতে হাত বুলিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। খিলাফতের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি মানুষকে বলতেন যে, এই জীবন, যা আমি লাভ করেছি, এটি এজন্য পেয়েছি যেন আমি ধর্মের সেবা করি আর এখন আমি এই কাজেই নিজের জীবন অতিবাহিত করব। আর এই অঙ্গীকার তিনি রক্ষা করেছেন। তিনি ৯৪ বছর বয়স লাভ করেছিলেন আর শেষ বয়স পযর্ন্ত তিনি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও নিকটবর্তী জামা'তগুলোতে স্বয়ং সফর করতেন। আমি যখন ২০০৮ সনে ঘানা সফরে যাই তখন আমার সাথে তার ২য় বার সাক্ষাৎ হয়। সেখানেও

তিনি আসেন এবং জলসায় অংশগ্রহণ করেন, জুবলীর জলসা ছিল এটি। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন।

মিশনারী বান্দুকু শাহেদ সাহেব বলেন, পাকিস্তানী মুবাল্লেগদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। অনেক বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের সাথে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, এ বছর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমি যখন তার গ্রামে সফরে যাই তখন মুয়াল্লেম সাহেব আমাকে বলেন যে, আমি এ বছর চলে যাব। আমি বললাম, আপনি কি কোথাও সফরে যাচ্ছেন? তিনি বলেন, না, আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, কেননা এ বছর আমি খুব খুশি। মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, এরপর তিনি বলেন আমি সারা জীবন আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করেছি, (আল্লাহ্‌র সত্তায় তার দৃঢ় আস্থা ছিল,) আর এখন আমি নিজ পারিশ্রমিক নেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ছি। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তার পরিবারকে বলেন যে, এখন আল্লাহ্‌র সাথে আমার আর এক সপ্তাহের চুক্তি রয়েছে, অর্থাৎ এক সপ্তাহ সময় বাকি আছে। পরবর্তী শুক্রবার এক সপ্তাহ পরে, সকালে রীতি অনুযায়ী তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন, ওযু করেন, ওযু কেবল শেষ করেছিলেন যে, ওযু করতে করতে সেখানেই সেই স্থানে নিজের প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। সেখানেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। তো এমন নিঃস্বার্থ এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ দূরদুরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করেছেন। যারা ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এমন নিঃস্বার্থ সেবক জামা'তকে সর্বদা দান করতে থাকুন যারা সত্যিকার সেবক হবেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৫ পুত্র ও ৬ কন্যাসন্তান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সবাই আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দৃঢ়তা দিন এবং তারা যেন নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হয়। জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লণ্ডন কর্তৃক অনূদিত)